# সুলোচনার কাহিনী

(গল্পগ্রন্থ – বিধু মাস্টার)

# ১

সন্ধ্যা হইয়াছে, সুকিয়া স্ট্রীট দিয়া যাইতেছি। ডাক্তারখানা খুলিতে দেরি হইয়া গিয়াছে, সময় হইয়া আসিল, সুতরাং হনহন করিয়াই চলিয়াছি—এমন সময়ে বাড়ি-ঘরের থামের ছায়ার আলো-আঁধারের মধ্যে একটি স্ত্রীলোককে দেখিয়াই আমি থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম।

যেন সেই সুলোচনার মা না ?অবিকল সেই রকম দেখিতে, যদিও বহুকাল দেখি নাই। কিন্তু তাও কি সম্ভব ?এতকাল পরে সুলোচনার মা বাঁচিয়া থাকিবে এবং কলিকাতা শহরেই থাকিবে ?

একটু জোরগলায় ডাক দিলাম—শুনছেন ?শুনছেন ?বলি শুনছেন—এই যে !

যে বৃদ্ধাটি ফিরিয়া দাঁড়াইল আমার ডাক শুনিয়া এবং হয়তো বা তাহাকেই কেহ ডাকিতেছে মনে করিয়া—বিস্ময়ের সহিত দেখিলাম সে সুলোচনার মা-ই বটে।

সুলোচনার মা কাছে আসিল। প্রথমে চিনিতে পারিল না, পরে পরিচয় দিতেই দন্তহীন মুখে একগাল হাসিয়া বলিল—ও তুমি যদু ! আহা কতকাল দেখিনি তোমাদের !—ইত্যাদি বা ওই ধরনের কোনো উক্তি।

আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের যবনিকা হঠাৎ সরিয়া গেল। গত মহাযুদ্ধেরও কয়েক বৎসর পূর্বের কলিকাতা...ঘোড়ার ট্রাম সবেমাত্র বন্ধ হইয়াছে...তখনকার আমলের অতি সুন্দরী আধুনিকাদের মধ্যে যে আমার চোখে সর্বপ্রধান সুন্দরী এবং সবচেয়ে আধুনিকা ছিল, কিছুকাল পরে যাহাকে জীবনের জনসমুদ্রে একদম হারাইয়া ফেলি, এ সেই মেয়েটির মা।

তখনকার মেয়েদের চুল বাঁধিবার রীতি বা কাপড়-চোপড় পরিবার ধরন একালের মতো ছিল না বটে, কিন্তু সত্যিকার সুন্দরী যে হয়, তাহাকে যে-কোনো সাজে, যে-কোনো ঢঙে, যে-কোনো ভঙ্গিতে মানায়, এবং সুলোচনা ছিল সেই ধরনের সুন্দরী মেয়ে। তাহার সেই দীর্ঘ ঋজু চম্পক-গৌর যৌবনদীপ্ত দেহ, লম্বা টানা কালো কালো ডাগর চোখ, কালো কোঁকড়া চুলের রাশি, নিটোল সুগঠিত বাহু দুটি, সুন্দর মুখশ্রী কলিকাতার পথেঘাটে গলির আড়ালে আবডালে, পথের বাঁকে হঠাৎ ফিরিয়াই, কিংবা কোনো নির্জন পার্কে পদচারণরত অবস্থায় কতদিন কল্পনানেত্রে দেখিতাম, দেশে ফিরিয়া কত বর্ষণমুখর শ্রাবণ বা ভাদ্র রজনীতে এক-ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া প্রথম যৌবনের রঙিন নেশায় যাহার মুখ কতবার মনে পড়িত—সেই সুলোচনার কোনো খবর পাই নাই আজ এত বছর, ধীরে ধীরে কবে সে বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছিল...আবার পুরানো যুগের সেই মেয়েটি ১৯৩০ সালের কলিকাতায় কোথা হইতে ফিরিয়া আসিল।

একটি প্রেমের কাহিনী। তবে সে-প্রেমের নায়ক আমি নই, গোড়াতেই কথাটা বলিয়া রাখা ভালো। সব যুগেই মেয়েরা যেমন ভালোবাসে, ভালোবাসিয়া কষ্ট পায়, মুখ বুজিয়া সহ্য করে, তিলে তিলে নির্বোধের মতো নিজের দেহ ক্ষয় করে দুশ্চিন্তায়, দুর্ভাবনায়...অত রূপ লইয়াও সুলোচনা সে-দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি পায় নাই জানিতাম, তাই পরবর্তী সময়ে মেয়েদের যখন ভালো করিয়া জানিয়াছিলাম ও বুঝিয়াছিলাম তখন সেকালের তরুণী প্রেমিকা সুলোচনার জন্য মাঝে মাঝে মনটা কেমন করিয়া উঠিত।

যাক এখন সে-সব কথা। বর্তমানের কথাই আবার বলি।

সুলোচনার মা অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছে, আজ দেখিয়াই বুঝিলাম। কিন্তু সুলোচনার মা ভিক্ষা করিতেছে কেন ?সুলোচনা কোথায় ?কারণ ভিক্ষাই সে করিতেছিল। থামের পাশে দাঁড়াইয়া রাস্তার লোকের কাছে দু-একটি পয়সা চাহিতেছিল আমি লক্ষ্য করিয়াছি।

আমাকে পূর্বপরিচিত বলিয়া বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধা একটু সংকুচিত হইয়া পড়িল। তাহার সে-ভাবটা কাটাইয়া দিবার জন্য বলিলাম—এখানেই কোথাও বাসা বুঝি ?দোকানে জিনিস কিনতে এসেছিলেন ?ভালো আছেন ?

—আর বাবা, ভালো আর মন্দ ! তুমিও যেমন !

কথাটা ভালো লাগিল না, সুতরাং যে প্রশ্নটি এতক্ষণ করিতে বাধ-বাধ ঠেকিতেছিল, সেটা করিয়া ফেলিলাম। ভাবিয়া দেখিলাম সুলোচনার বয়স এখন হিসাবমতো প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ—সুতরাং তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতে সংকোচের কারণ কি আছে ?সে এখন আর ব্রীড়াবনতা সুন্দরী কিশোরী প্রণয়িনী নয় কারো !

—ইয়ে,—গিয়ে—সু—আপনার মেয়ে কোথায় ?

—তাই তো বলছি বাবা, সে কি আর আছে ?সে থাকলে আমার আজ এই...বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি এ উত্তরের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। অপ্রতিভের মতো বলিলাম—ও !...

দু-জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। পরে আমিই বলিলাম—আজকাল আছেন কোথায় ?

—রাস্তায়—গবর্নমেন্টের রাস্তায়।

সবই বুঝিলাম। বড় কষ্ট হইল এ-কথা বলিলে ঠিক কথা বলা হইবে না। কষ্ট হইলেও বুড়ির জন্য হয় নাই। বুড়িকে কিছু পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দিব ভাবিতেছি এমন সময়ে সে বলিল—তোমার সঙ্গে দেখা হল বড় ভালো হল বাবা। আমার ঘাড়ে সব ফেলে দিয়ে হতভাগী তো পালাল, এখন তার দুটি ছেলে, একটির বয়েস ষোল আর একটির চোদ্দ, এদের নিয়ে আমার কি দুর্দশা ভাব দিকি এ বয়সে ! একটা ঘরে আছি—এখনই ভাড়া দিতে না পারলে তাড়িয়ে দেবে বলেছে। তাই বলছি রাস্তা ছাড়া এখন যাব কোথায় ?

—সুলোচনা কত দিন মারা গিয়েছে ?

—এই চোদ্দ বছর। ওই কোলের ছেলেটি যখন দু-মাসের—সেই থেকে মানুষ করছি।

আমার হঠাৎ একটি কথা মনে হইল। সুলোচনাকে আমি জানিতাম বটে, কিন্তু তার আসল ইতিহাস আমার কাছে রহস্যাবৃত ছিল। আমি খানিকটা বুঝিতাম, খানিকটা বুঝিতাম না—তাহার আর একটা কারণ, আমার বয়সও তখন কম ছিল। রূপসী সুলোচনা আমার কাছে চিরদিন নারীত্বের গহন রহস্যের প্রতীক হইয়া আছে। এই উত্তম সুযোগ। বড় কৌতূহল হইল, উহার মায়ের মুখে তাহার ইতিহাস সব শুনিব।

বৃদ্ধাকে বলিলাম—আপনি শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বসে থাকবেন কাল বিকেল পাঁচটার সময়—আমি আসব। বাড়িভাড়ার ব্যবস্থা যা হয় করা যাবে।

বুড়ি ছাড়িল না, তাহার বাসা দেখিতে হইবে এখনই। অগত্যা গেলাম। বাসা দেখিয়া মনে হইল, তেমন ঘরে মানুষ থাকিতে পারে না, গরু থাকিলেও কষ্ট পায়। একতলায় ছোট্ট অন্ধকূপের মতো ঘর, একটি মাত্র দোর, যেটা দিয়া ঢুকিতে হয়—দ্বিতীয় দরজা বা জানালা নাই। এই পচা ভাদ্রে কি ভীষণ গুমোট ঘরের মধ্যে।

সুলোচনার ছেলেরা একটু পরে আসিল। বড় সুন্দর ছেলে দুটি। সুলোচনার মুখচোখ ভুলিয়া গিয়াছিলাম; ইহাদের—বিশেষ করিয়া ছোট ছেলেটিকে দেখিয়া আবার সুলোচনাকে স্পষ্ট মনেপড়িল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যাত্রাদলে কৃষ্ণ সাজে একটি, অপরটি গান গায়।

হায় অভাগী সুলোচনা !...

তখনকার কালের শৌখিন মেয়ে, তখনকার কালের আধুনিকা স্মার্ট মেয়ে সুলোচনার মা ও ছেলেদের এ কি গৃহ, এ কি গৃহসজ্জা !...ছেঁড়া চটের বিছানা, চটের মধ্যে বিচুলির কুচি-পোরা বালিশ, ভাঙা কলাইচটা এক-আধখানা সানকি, একটা মাটির কলসি আর দড়ির আলনায় অতি মলিন খান দুই-তিন কাপড় ও জামা। একখানা কেওড়া কাঠের হাত-দুই চওড়া তক্তপোশআছে—ছেলে দুটি তাতে শোয়, বুড়ি শোয় মেঝেতে। তাও এই ঘরে আশ্রয় মিলিতেছে কই ?এই আস্তাবল হইতেও বাড়িওয়ালা নাকি ইহাদের তাড়াইয়া দিবে বলিতেছে !

এই কাহিনীটি আর বেশিদুর অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইবার পূর্বে সুলোচনা কে ছিল, তাহার সহিত আমার কি ভাবে আলাপ—ইহা বলিব। নতুবা গল্পের অংশও ভয়ানক খাপছাড়া ঠেকিবে।

## ২

১৯০৬ সালে দেশের ইস্কুল হইতে এন্ট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতার কলেজে পড়িতে আসিয়াছি। বেচু চাটুজ্যের স্ট্রীটে আমারই স্বগ্রামস্থ এক বন্ধুর বাবা ছেলেপুলে লইয়া বাসা করিয়া থাকিতেন, সেইখানেই উঠিয়াছি। আমার বন্ধুটির দাদা তখন বি. এ. পড়েন এবং তাঁহারই সঙ্গে দেখা করিতে প্রকাশচন্দ্র বসু নামে তাঁহারই এক বন্ধু বাসায় ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন। এই প্রকাশবাবু বড় অদ্ভুত লোক। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে মনেপ্রাণে যোগ দেওয়ার ফলে পুলিশের হাতে গুরুতর প্রহার খাইয়া নাকি কিছুদিন হাসপাতালে এবং কিছুদিন জেলে ছিলেন। তিনি নিজের হাতে কাহাকেও বোমা মারিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই—কিন্তু আলিপুর বোমার মামলার সময় পুলিশ দিনকতক তাঁহার পিছু পিছু ঘুরিয়াছিল। খুব বলিষ্ঠ দীর্ঘ চেহারা, মুখের ভাবে বুদ্ধিমত্তা ও মননশীলতার ছাপ অতি সুস্পষ্ট। প্রেসিডেন্সি কলেজের বি.এ. ক্লাসের ছাত্র, ছাত্র হিসাবেও যথেষ্ট মেধাবী।

আমরা প্রকাশদাকে যথেষ্ট খাতির করিয়া চলিতাম। তিনি বাড়িতে আসিলে বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত খুশি হইয়া উঠিতেন। প্রকাশের জন্য এ-খাবার করা, প্রকাশের জন্য ও-খাবার করা; চা কোথায়, চেয়ারের উপর পাতিবার কুশন কোথায়; মিনি তাহার হাতের উলের কাজ দেখাইতে ছুটিতেছে; ডলি পড়া বলিয়া লইবার ছুতা করিয়া প্রকাশদার সঙ্গে দুটি কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছে—প্রকাশদার কাছে যেন বাড়িসুদ্ধ লোকের মন বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিবার অধিকার ছিল না বাড়িতে, তাহা হইলে সকলেই একসঙ্গে তুমুল প্রতিবাদ তুলিবে।

প্রকাশদার সঙ্গে মাঝে মাঝে সতীশ রায় বলিয়া তাঁহার এক বন্ধু আসিতেন, মেডিকেল কলেজের ছাত্র, খুব বড় বড় চোখ, শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারা। ইঁহারা সবাই খুব স্ফূর্তিবাজ আমুদে ধরনের লোক—আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি মাতাইয়া তুলিতেন হাসি গল্প গানে। মাঝে মাঝে আবার কয় বন্ধুতে ঘরে খিল দিয়া কিসের পরামর্শ করিতেন—তখন আমাদের জানালা দিয়া উকিঝুঁকি মারাও নিষেধ ছিল।

কৌতূহল চাপিতে না পারিয়া একদিন বন্ধু শরৎকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওরা ঘরে দোর দিয়ে কি করে রে ?

শরৎ চুপিচুপি বলিল—কাউকে বলিসনি ভাই, ওরা সব অ্যানার্কিস্ট।

—তোর দাদাও ?

—হ্যাঁ। ওরা দাদাকে দলে নিয়েছে।

শুনিয়া মনের মধ্যে একটা কৌতূহল ও উত্তেজনা অনুভব করিলাম। অ্যানার্কিস্টদের সঙ্গে এক বাসায় আছি ভাবিয়া ভয়ও হইল।

এইখানে একদিন প্রথম দেখিলাম সুলোচনার মাকে। নিজের ঘরটিতে বসিয়া পড়িতেছি, একটি প্রৌঢ়া বিধবা স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিল—প্রকাশ এখানে কবে এসেছিল ?আজ আসবার কথা আছে ?

দেখিলাম স্ত্রীলোকটির পরনে সাদা থান, বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের বেশি নয়, গায়ের রং খুব ধপধপে ফরসা, বয়স হইলেও মুখশ্রী দেখিতে ভালো। আমার মুখে প্রকাশবাবুর আসিবার সম্ভাবনা আছে শুনিয়া আমারই ঘরে সে বসিল। আমায় বলিল—তুমি কি করো ছেলে ?

—পড়ি ফার্স্ট ইয়ারে।

—এটা তোমাদের বাড়ি ?

—আমার বন্ধুর বাড়ি, আমি এখানে থাকি। বাড়িতে মেয়েরা আছেন—চলুন না বাড়ির মধ্যে, এখানে কেন বসে থাকবেন ?

এই ভাবে সুলোচনার মার সঙ্গে বাড়ির মেয়েদেরও আলাপ হইয়া গেল। সুলোচনার মা কিন্তু প্রকাশদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ছাড়া অন্য কার্যে কখনো আসে না, একদিন আমার এ কথা মনে হইল। বাড়ির মধ্যে মেয়েরাও এ-কথা বলিতে শুরু করিল। স্ত্রীলোকটি যে প্রকাশবাবুর কাছে টাকা লইতে আসে, তাহাও সকলে জানিয়া গেল। ক্রমে আমাদের সামনেই সে প্রকাশবাবুকে বলিত—ও প্রকাশ, বাবা এ-মাসে আর দশটা টাকা না দিলে মেয়ের বই হবে না। ক্লাসে তাকে বকে, বই না কিনে ইস্কুলে যাবে কি করে ?

আমার বন্ধুকে একদিন বলিলাম—ওঁর মেয়ে আছে তা তো এতদিন শুনিনি ! ওঁরা প্রকাশদার কেউ হন ?প্রকাশদা টাকা দেন কেন ওঁদের ?

বন্ধু বলিল—জানি ওঁর এক মেয়ে এখানে স্কুলে পড়ে। আমি শুনেছি মেয়েটি সধবা, কিন্তু তার স্বামীর কাছে থাকে না। মা ও মেয়ে কোথায় যেন বাসা করে থাকে, প্রকাশদা আর সতীশদা দুজনে খরচ দেন। দাদা এ-সব গল্প সেদিন মার কাছে করেছিল।

—তা প্রকাশদা আর সতীশদা টাকা দেন কেন ?

—ওঁরা অ্যানার্কিস্ট কিনা, দেশের আর দশের সেবা ওঁদের কাজ, বিশেষ করে প্রকাশদার। দাদা বলে, প্রকাশদা বাড়ি থেকে যে টাকা পান, তার বেশির ভাগ ওদের দিয়ে দেন, নিজে অনেক সময় টাকা ধার করতে আসেন দাদার কাছে। দুটো টিউশনি করেন, সে-টাকাও ওদের দিয়ে দেন।

আমার ক্রমে মনে হইল, বুড়ি প্রকাশদার কাছে নানা রকম ফন্দি ও ছুতায় টাকা আদায় করিতে আসে। আর সব সময়েই মেয়ের অজুহাতে। আজ আমার মেয়ের এ নাই, আজ আমার মেয়ের তা নাই, একটা না একটা ছুতা বুড়ির লাগিয়াই আছে। প্রকাশদাও যেন কল্পতরু, 'না' বলিতে শুনিলাম না কোনোদিন। বুড়ির উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলাম। বুড়ি বলিলাম বটে, কিন্তু সুলোচনার মা সে-যুগে বুড়ি ছিল না।

কতবার ভাবিতাম প্রকাশদাকে বলি, উহারা ফাঁকি দিয়া আপনার কাছে টাকা লইতেছে, আপনি যখনই যা চায় তা দেন কেন ?কিন্তু প্রকাশদাকে শ্রদ্ধা-সম্মান করিতাম, কখনো সাহস করিয়া কথাটা বলিতে পারি নাই।

## ৩

এখানে একদিন সুলোচনা আসিল তাহার মায়ের সঙ্গে।

দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। রূপসী বটে। পাড়াগাঁ হইতে কয়েক মাস মাত্র আসিয়াছি, অমন রূপ কখনো দেখি নাই। বছর যোল কি সতেরো বয়স, পিঠে দীর্ঘ কালো চুলের বিনুনি দোলানো, যেমন চোখ তেমন ধপধপে রং, তেমনই নিটোল স্বাস্থ্য, অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী।

বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে স্বভাবতই তার যথেষ্ট ভাব হইয়া গেল। তার পর প্রায়ই আসিতে লাগিল। বিশেষ করিয়া প্রকাশদার আসিবার সময়টাতেই আসে এবং বেশির ভাগ কথাবার্তা বলে প্রকাশদার সঙ্গেই। প্রকাশদা উপস্থিত থাকিলে সেই যে তাহার চেয়ারের পিছনটি ধরিয়া দাঁড়ায়, তিনি যতক্ষণ এ-বাড়িতে থাকেন, বড় একটা অন্য কোথাও নড়িতে দেখি নাই।

প্রকাশদা উঠিয়া চলিয়া গেলে সুলোচনা আমাদের বড় বিরক্ত করিত। হয়তো বা আমাদের সে মানুষ বলিয়াই মনে করিত না, কে জানে ! টেবিলে বসিয়া পড়িতেছি, সুলোচনা হঠাৎ আসিয়া বইখানা টানিয়া লইয়া গেল, নয়তো পিছন হইতে আসিয়া দুই হাত দিয়া চোখ চাপিয়া ধরিল, নয়তো ভূতের গল্প শুনিবার আবদার ধরিয়া বসিল। পড়িতে দিবে না কিছুতেই, পড়া থাক, তাহারসঙ্গে ছাদে কে যাইবে ?ডলির পুতুলের শুভ-বিবাহ এখনই ছাদে অনুষ্ঠিত হইবে তাহার পুতুলের সহিত—ইত্যাদি। এক-এক দিন এক-এক রকমের ব্যাপার।

কিন্তু প্রকাশদা থাকিলে সুলোচনা এ রকম করিত না। তখন তার অন্য মূর্তি। ধীর, স্থির, বেশি হাসিত না, বেশি বকিত না, কেমন যেন সলজ্জ, সকুণ্ঠ চোখমুখের ভাব, কতদিন দেখিয়াছি।

প্রকাশদা সুলোচনাকে 'সু' বলিয়া ডাকিতেন বলিয়া আমরাও সবাই তাকে 'সু' বলিতাম। একদিন সুলোচনা তাহাতে আপত্তি করিল। শরৎকে বলিল—প্রকাশদা যা বলেন, তোমরাও তাই বলবে কেন ?ও নামে ডেকো না, কানে ভালো লাগে না।...আমার বড় রাগ হইল। সুলোচনার চাল-দেওয়া ধরনের কথাবার্তা আমার সহ্য হইত না—আমার মনে হইত মেয়েটি অত্যন্ত গর্বিত ও চালবাজ। রাগের ঝোঁকে বলিলাম--তাহলে তুমিও আমাদের সঙ্গে মিশতে এসো না। সুলোচনার সহিত আমাদের এ ধরনের খুনসুটি ঝগড়া প্রায়ই চলিত। তবে সে যে সব সময়েআমাদের বাসায় আসিত তা নয়, মাসের মধ্যে দশ-বারো দিনের বেশি না। প্রকাশদা এখানে যে-যে দিন আসিবেন, এমন দিন ছাড়া সুলোচনার এখানে আসা কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিতাম। সতীশদার প্রতি সুলোচনা যেন তেমন সন্তুষ্ট নয়, অথচ সতীশদা সুলোচনা বলিতে অজ্ঞান ছিলেন। আমার বন্ধু শরৎ বলিত, সুলোচনাদের কলিকাতার বাসাভাড়া ও বাসার সমস্ত খরচ নাকি সতীশদা দিতেন। কিন্তু সুলোচনা সতীশদাকে কেন যে দেখিতে পারিত না তাহা কি করিয়া বলিব ?

একদিনের কথা বলি। সেদিন সতীশদা আসিবার কিছু পরে সুলোচনা তাহার মায়ের সঙ্গে আসিয়া হাজির। সুলোচনার মা বলিল—সতীশ, আমাকে দক্ষিণেশ্বরে ঘুরিয়ে আনবে বাবা ?সুলোচনাও বলিল—হ্যাঁ মামা (সতীশবাবুকে সুলোচনা মামা বলিয়াই ডাকিত), চল আমিও যাব।

সতীশদা হাতে যেন স্বর্গ পাইয়াছেন, তাহার চোখমুখের খুশির ভাগ দেখিয়া তাহাই মনে হইল। উৎসাহের সহিত বলিলেন—হাঁ হাঁ। বরং চল দক্ষিণেশ্বর থেকে আমরা বরানগরে স্বামী অবধূতানন্দের আশ্রম দেখে আসব—সে-ও বড় চমৎকার জায়গা গঙ্গার ধারে।

সুলোচনার মা বলিলেন—তাহলে অমনি পেনেটির দ্বাদশ শিবের মন্দিরও দেখে আসি চল না ?

সুলোচনাও বলিল—বড্ড মজা হয় মামা। বড্ড মজা হয় মামা। একখানা গাড়ি ডাকো। সতীশদা গাড়ি ডাকিতে গিয়াছেন, এমন সময় প্রকাশদা আসিয়া পড়িলেন। সুলোচনা তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিল তাঁহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য। তিনি কেন যাইতে চাহিলেন না তাহা আমি জানি না, সঙ্গে সঙ্গে সুলোচনাও তাহার মাকে বলিল—সে

কোথাও যাইবে না, মায়ের ইচ্ছা থাকিলে তিনি একাই যাইতে পারেন। সতীশদা ইতিমধ্যে গাড়ি আনিয়া উপস্থিত করিলেন, কিন্তু ঘটনার নূতন পরিস্থিতি দেখিয়া বড় নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। প্রকাশদাও সুলোচনাকে যাইবার জন্য যথেষ্ট বলিলেন, এমন কি শেষে রাগও করিলেন, সুলোচনা কিন্তু কিছুতেই গেল না। অবশেষে বেচারি সতীশদার শুধু সুলোচনার মাকে লইয়াই যাইতে হইল। অবশ্য আমার বন্ধুর বাড়ির মেয়েরা কেউ কেউ সঙ্গে গেলেন—এতগুলি মেয়ে গেল, তবুও সুলোচনা এক পা-ও নড়িতে চাহিল না।

বছর দুই এইভাবে নানা সুখদুঃখের ঘটনার মধ্য দিয়া কাটিয়া পরে ১৯০৮সালে আমাদের বাসা উঠিয়া গেল। আমি কলেজের হোস্টেলে আশ্রয় লইলাম। সুলোচনাদের সহিত সম্পর্ক ঘুচিয়া গেল। আমার ছাত্রজীবনের বাকি বৎসরগুলির মধ্যে সুলোচনা বা তাহার মায়ের সঙ্গে চোখের দেখাও হয় নাই একদিনের জন্য। সতীশদাকেও আর কখনো দেখি নাই। ইহাদের না দেখিবার কারণ যথেষ্ট ছিল, পুলিশের চাপেই বাসা উঠাইতে হইয়াছিল।

তবে প্রকাশদার সম্বন্ধে বিশেষ ঘটনা এই যে, আমার ছাত্রজীবনের তৃতীয় বৎসরে প্রকাশদা অদ্ভুতভাবে নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। আর কেহ কোনোদিন তাঁহাকে দেখে নাই; পূর্ববঙ্গের কোথায়স্বদেশী ডাকাতি করিতে গিয়া পুলিশের গুলিতে মারা পড়িয়াছেন, কয়েক বছর পরে বিশ্বস্তসূত্রে একথা শুনিয়াছিলাম।

বছর পাঁচ-ছয় পরের কথা। কলেজ হইতে বাহির হইয়া কলিকাতার বাহিরে চাকুরি করি। কি একটা ছুটি উপলক্ষে হাওড়া স্টেশনে নামিয়া শেয়ালদহ দিয়া বাড়ি ফিরিতেছি। তখনকার আমলে শেয়ালদহ নর্থ স্টেশন হয় নাই—যেখানে আজকাল নর্থ স্টেশনের সম্মুখে ভাড়াটে গাড়ির আড্ডা, ওখানে অনেক চা পান শরবত ইত্যাদির দোকান ছিল। একটি দোকানে শরবত খাইতে গিয়াছি, দেখিলাম একটি ছোকরা এবং তাহার সহিত একটি সুবেশা তরুণী সেখানে দাঁড়াইয়া ভাঁড়ে করিয়া শরবত খাইতেছে। দু-একবার গোপনে মেয়েটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম—বয়স বাইশ-তেইশ হবে—চোখ যেন ফিরানো যায় না তাহার দিক হইতে। না, অপূর্ব রূপসী বটে মেয়েটি।...আমিই শুধু চাহিয়া নাই, আশপাশের অনেকেরই দেখিলাম আমার দশা।

হঠাৎ আমাকে ভীষণ চমকিত ও আশ্চর্য করিয়া দিয়া তরুণী আমার একেবারে সামনে আসিয়া হাসিমুখে বলিল—আরে যদুদা যে !

বলিয়াই সে আমার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। চিনিতে অবশ্য বিলম্ব হইল না, বলিলাম—সুলোচনা যে ! কোথা থেকে ?তোমার মা কোথায় ?কি করছ এখন ?

সুলোচনা এ-সব কথার কোনো উত্তর না দিয়া সর্বপ্রথম আমায় প্রশ্ন করিল—প্রকাশদার কোনো খবর পেয়েছ ?

প্রকাশদার মৃত্যুসংবাদ তখন আমি শুনিয়াছি, কিন্তু সেকথা বলিলাম না।

সুলোচনা আমায় ছাড়িতে চায় না, তখনকার পরিচিতদের মধ্যে এ কেমন আছে, ও কেমন আছে, আমার বন্ধু শরৎ এখন কোথায়, তাহার দাদা বিনোদ কি করে, তাহাদের বিবাহ হইয়াছে কিনা—নানা মেয়েলি প্রশ্ন। আমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল—অনেকদিন পরে দেখা, খাওয়াও দেখি, চল তো রায় মশায়ের হোটেলে !

সেই পুরানো দিনের মতোই নিঃসংকোচ ব্যবহার সুলোচনার; মেয়েমানুষ হইয়াও ছেলের মতো ব্যবহার, ধরন-ধারণ, সেই সবই বজায় আছে অবিকল। তবে তাহার পরনে চওড়া জরিপাড় ফিকে নীল শাড়ি ও ব্লাউজের বাহার, গলায় চিকচিকে সরু চেন ও পেনডেন্ট, পায়ে রুপালি ব্রোকেডের জুতা, সুগঠিত পেলব সুগৌর হাতে সোনার চুড়ির সঙ্গে সরু-ফিতা বাঁধা হাতঘড়ি প্রভৃতি দেখিয়া মনে হইল সুলোচনার অবস্থা ফিরিয়াছে। সুলোচনার শৌখিনতার প্রতি স্নেহ হইল—এমন সুন্দরী মেয়েরা বেশভূষা না করিবে, সেন্ট-পাউডার না মাখিবে—তবে সেসব সৃষ্টি হইয়াছে কাহাদের জন্য ?সুলোচনার অঙ্গে শাড়ি ব্লাউজ অলংকার উঠিয়া নিজেরাই ধন্য হইয়া যায় নাই কি !

আমি বলিলাম—আরে ছাড়ো ছাড়ো, হাত ধরে ওরকম টানাটানি করো না—রায়মশায় কেন, চল ট্রামে ন্যাশনাল হোটেলে যাই কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে। কিন্তু সঙ্গের ছোকরাটি বাদ সাধিল, নতুবা সুলোচনাকে লইয়া যাওয়া কষ্টকর হইত না।

ঘড়ি দেখিয়া বলিয়া বসিল—ট্রেনের দেরি নেই, কোথায় যাবে এখন বউদি ?এসো, চল— বাঃ ! এমন কি মনে হইল যে, ছোকরা যেন সুলোচনার উপর জোর খাটাইতেছে। রাগ হইল—কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছ বাপু ! সুলোচনাকে আমরা ছেলেবেলা হইতে জানি, তুমি তখন জন্মাও নাই। আজ আসিয়াছ আমাদের সামনে সুলোচনাকে ঘড়ি দেখিয়া টাইম বলিয়া দিতে ! সুলোচনা যে খুব ভালো মেয়ে নয়, এ ধারণা আমার পূর্ব হইতেই ছিল, এখন সে ধারণা আরো বদ্ধমূল হইল। বেচারি প্রকাশদা ! মেয়েদের ভালোবাসার এই তো মূল্য ! অন্তত সুলোচনার মতো মেয়েদের। মনটা অশ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া গেল। সুলোচনাকে লইয়া ছোকরা স্টেশনের দিকে চলিয়া গেল।

সুলোচনা যাইতে যাইতে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—দমদমায় বাসা আজকাল। যেয়ো একদিন—মা আছেন বাসায়। বিস্কুটের কারখানার পিছনে নরেশ পালের বাগানবাড়ি—

বলা বাহুল্য, দমদমার নরেশ পালের বাগানবাড়ি খুঁজিয়া সেখানে যাইবার সুবিধা ও সময় আমার হইয়া উঠে নাই।

বছরখানেক পরে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব বৎসর ১৯১৩ সালে আমি সন্ধ্যার দিকে এসপ্ল্যানেডের মোড়ে ট্রাম ধরিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় একখানি ট্রাম আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ দেখিলাম প্রথম শ্রেণীর কামরায় একখানি বেঞ্চিতে সুলোচনা একা বসিয়া আছে। আমি তখনই বিন্দুমাত্র না ভাবিয়া ট্রামখানাতে উঠিয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িলাম। সুলোচনা প্রথমটা চমকিয়া উঠিয়াছিল, পরে আমাকে দেখিয়া ও চিনিতে পারিয়া ভারি খুশি হইল। বলিল—উঃ, যা ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলে ! আমি বলি কে এসে ঝুপ করে পাশে বসে পড়ল রে বাবা !—ভালো ?কতদিন দেখা হয়নি—সেই শেয়ালদা স্টেশনে সেবার—দাঁড়াও, প্রণামটা করি।

কথাবার্তা বলিতে বলিতে চাঁদনির মোড়ে ট্রাম আসিল। সুলোচনা বলিল—নামো এখানে যদু-দা, কুরুশ-কাঁটা কিনব আর ছেলেটার জন্য হর্লিক কিনব। আমি উহার মুখের দিকে আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া আছি দেখিয়া সুলোচনা সলজ্জমুখে বলিল—আজকাল আমার স্বামী এসেছেন যে, আজ প্রায় বছরখানেক। এখন যে রোজগার করছি দু-পয়সা, আসবে বৈকি ! এতদিন কেউ খোঁজও নেয়নি !

—আজকাল কি করো ?

—বা রে, আজকাল তো ক্যাম্বেলে নার্সগিরি করি। এতদিন নার্সদের হোস্টেলে ছিলাম। এখন স্বামী ফিরে আসতে বাসা করেছি দমদমাতে। সেই আর বছর যখন তোমার সঙ্গে দেখা তখন থেকে দমদমায় বাসা। এসো না আজ, চল—আমার খোকাকে দেখে আসবে এখন—

—না, আজ থাক, আর এক দিন হবে। চল—চা খাবে সুলোচনা ?

—শোন বলি। তুমি হলে গিয়ে খোকার মামা, শুধু হাতে যেন যেয়ো না। ওকে একটা হার কেন দাও না।

আমার বড় রাগ হইল। দম দিয়া টাকা আদায় করিয়া লইতে সুলোচনা মায়ের মতোই পটু হইয়া উঠিয়াছে। আপন মামা হইলেও আজকালকার বাজারে শুধু টাকা দিয়া মুখ-দেখা সারে, আর আমি কোথাকার কে, হার কেন দিতে যাইব ?বলিলাম—এখন যাব না তোমার বাসায়। বড় ব্যস্ত আছি।

ট্রাম হইতে নামিয়া আমরা একটা গ্যাসপোস্টের তলায় দাঁড়াইয়াছি, গ্যাসের আলোয় সুলোচনাকে দেখিয়া সত্যই মুগ্ধ হইয়া গেলাম। এ রকম রূপসী মেয়েকে লইয়া কোনো চায়ের দোকানে ঢুকিতে সংকোচ মনে হয়—বিশেষত মনে রাখিবেন ১৯১৩ সালের কলিকাতা, তখনকার দিনে মেয়েরা পথেঘাটে খুব কমই বাহির হইত।

হইলও তাই, চায়ের দোকানসুদ্ধ লোক হাঁ করিয়া একদৃষ্টে সুলোচনার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার উপর সুলোচনার মুখে খই ফুটিতেছে কথার। সে চুপ করিয়া থাকিতে জানে না, আমি বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম।

আমায় বলিল—যাবে না বই কি, ইঃ ! ভাগ্‌নের মুখ দেখোনি, দেওয়ার ভয়ে বোনের বাড়ি যাবে না—লজ্জা করে না বলতে ?যেতেই হবে, আমি নেমন্তন্ন করছি সামনের শনিবারে যাবে, ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

ইহার সব ব্যাপারই রহস্যাবৃত; কোথায় এতদিন ইহার স্বামী ছিল, কোথা হইতে বা আবার আসিল, এ-সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইলেও চাপিয়া গেলাম। তবে সুলোচনা কখনো মিথ্যা বলে না ইহা আমি জানিতাম। পূর্বেও দেখিয়াছি এমন সব অবস্থায় সত্য কথা বলিত যেখানে সত্য বলিলে তাহার নিজেরই ক্ষতির সম্ভাবনা। কাজেই সুলোচনার কথায় আমার অবিশ্বাস হয় নাই।

চা খাওয়া ও উল বোনার কাঁটা কেনার পরে আমি তাহাকে গাড়িতে উঠাইয়া দিতে আসিলাম। গাড়ির কামরায় বসিয়া সে তাহার পাশে বেঞ্চিতে হাত চাপড়াইয়া বলিল—এসো, বোসো যদু-দা !

বলিলাম—আজ নয় সুলোচনা—মাপ করো। কাজ আছে।

সুলোচনা অভিমানের সুরে বলিল—না, থাক্ কাজ। এসো—আসতেই হবে ! কত কথা আছে তোমার সঙ্গে রাস্তায় দেখা, কি কথাই বা হল ! পুরোনো দিনের কথা আর কার সঙ্গে কইব ?

পরে হঠাৎ আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, প্রকাশদার আর কোনো খবর পাওনি ?

—বেঁচে নিশ্চয়ই আছেন, তবে পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে আছেন বলে মনে হয়। তাঁর কথা যে কইব, এমন আর লোক কই এক তুমি ছাড়া ?

—কেন, সতীশদা কোথায় ?

—মামা ?মামা বিয়েথা করে দেশে দিব্যি সংসারী হয়ে বসেছে। তার মতো মানুষে আর এর বেশি কি করবে। প্রকাশদার মতো কি সবাই ?

গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা দিল। সুলোচনা বিস্ময়ের সুরে বলিল—সত্যি, আসবে না নাকি যদু-দা ?এসো বসো।

বলিয়া আমার হাত ধরিতে গেল।

কিন্তু আমার যাওয়া হইল না। যাইবার প্রবৃত্তি হইল না। তা ছাড়া সেই রাত্রেই আমাকে কর্মস্থানে ফিরিতে হইবে—সুলোচনার সঙ্গে গেলে ট্রেন ফেল করি। চাকরি বজায় রাখিয়া তবে অন্য কথা।

তখন কি জানি সুলোচনার সহিত এই শেষ দেখা।

সতেরো-আঠারো বৎসর পূর্বের কথা এ-সব।

## ৪

সুলোচনার মা পার্কে আসিল।

তাহাকে বাড়িভাড়ার টাকা মিটাইয়া দিয়া বলিলাম—এখন বলুন তো, আমি অনেক কথাই জানতাম না আপনাদের সম্বন্ধে, না জানি, ভাসা-ভাসা ভাবে জানি। সবটা বলুন।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। পার্কে ছেলেমেয়েরা দোলনায় দুলিতেছে, চেঁচামেচি করিতেছে, ঘুগনি চানাচুর কিনিতেছে।

সুলোচনার মায়ের নিকট হইতে নানারূপ জেরা করিয়া যে তথ্যটি উদ্ধার করিয়াছিলাম সেদিন, তাহা যেমন করুণ, জীবনের গভীর অনুভূতির দিক হইতেও তেমনই অপূর্ব। কিন্তু বৃদ্ধার কথায় বলিলে ঠিকমতো গুছাইয়া বলা হইবে না, তাই নিজে খানিকটা গুছাইয়া বলিবার চেষ্টা করিলাম।...

ওদের বাড়ি বর্ধমান জেলা। সুলোচনার যখন আট বছর বয়স, তখন ওর বিবাহ হয় পাশের গ্রামে। স্বামীর বয়স তখন ত্রিশ-বত্রিশ। স্বামীর চেহারা ভালো ছিল না বলিয়া ছেলেমানুষ মেয়ে তার কাছে বড় একটা যাইতে চাহিত না ! স্বামী ছিল মূর্খ ও গোঁয়ার প্রকৃতির লোক, আট বছরের স্ত্রীর উপর মারধোর ও নানারকম অত্যাচার শুরু করে। ফলে ওর মা দেশের জায়গাজমি বিক্রয় করিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া কলিকাতায় আসিল—তখন সুলোচনার বয়স দশ বৎসর। উদ্দেশ্য, মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইয়া স্বাধীনভাবে থাকিবার কোনো সুবিধা করিয়া দিবে।

কিন্তু তখনকার কালে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা বা স্বাধীন জীবিকা উপার্জন প্রভৃতিতে লোকে ভালো চোখে দেখিত না। মা মেয়ের হাত ধরিয়া নানা জায়গায় বেড়াইল। হাতের পয়সাসম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়া গেল—কিন্তু বিশেষ কোনো সুবিধা হইল না। এদিকে আরো নূতন উপসর্গ, মেয়ে অপূর্ব রূপসী, দশ বছরের হইলে কি হয়, তাহাকে দেখায় তেরো-চৌদ্দ বছরের মতো—দুষ্ট লোকের চোখ পড়িল মেয়ের উপর।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরিয়া মা মেয়েকে বলিল—চল আজ গঙ্গায় ডুবে মরব দুজনে— এখানে আর কোনো সুবিধে নেই—এবার মান যাবে, গরিবের কেউ নেই।

মেয়ে তৎক্ষণাৎ রাজী হইল।

রাত নটার সময় মেয়ে বলিল—কখন আমরা ডুবব মা ?অন্নপূর্ণার ঘাটে চল যাই !

মা বলিল—এখনো সব ঘাটে লোক। এখন না, দেরি করো—

রাত দশটার সময় মা মেয়ে হাত ধরিয়া বাগবাজারের অন্নপূর্ণার ঘাটে সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিতেছে—হ্যাঁ রে, পারবি তো ?বল আগে থেকে, পারবি তো ?

মেয়ে এতটুকু ভয় খায় নাই। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—তুমি সঙ্গে থাকলে মা ঠিক পারব।

সেই সময় যামিনী ঘোষ বলিয়া একটি ছোকরা, আপিসের কেরানী, ঘাটের কাছেই কোথায় বসিয়া হাওয়া খাইতেছিল। সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনারা এত রাত্রে এখানে কেন ?আর ব্যাপারই বা কি ?কি বলাবলি করছেন আপনারা ?বাসা কোথায় আপনাদের ?

যামিনী ঘোষের প্রশ্নের স্বরে বালিকা থতমত খাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মা সব খুলিয়া বলাতে সে-রাত্রে যামিনী মা ও মেয়েকে নিজের বাসায় লইয়া গেল।

দিন পনেরো কাটিল মন্দ নয়। যামিনী ছেলেটি খুব ভালো, কিন্তু ইহার এক বন্ধু সম্ভবত যামিনীর মুখে ইহাদের ইতিহাস শুনিয়া একবার দেখিতে আসিল। সেই যে আসিল, আর সে বাড়ি ছাড়িতে চায় না। তার আসা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়াইয়া গেল। সুলোচনাও সকলের সামনে চিরকাল বাহির হয়, তখন তো আরো ছেলেমানুষ।

ছোকরা মাথার পিছনদিকে চুল ফিরাইত বলিয়া সুলোচনা আড়ালে মার কাছে তাহার নাম রাখিয়াছিল—কাকাতুয়া। একদিন মেয়ে মাকে বলিল—মা, কাকাতুয়া ভারি দুষ্টু। আমাকে গহনার বাক্স দেখিয়ে বলে কিনা—আমার সঙ্গে যাবি ?তোকে এই সব গহনা দেব—আমি ওর সামনে আর বেরোব না।

মা বলিল,—হতচ্ছাড়া মেয়ে, তুই বা যাস কেন সকলের সামনে। বাড়ির মধ্যে থাকবি, যার-তার সামনে বেরোনো, গল্প করা কি ভালো ?আমরা গরিব লোক, আমাদের কত বিপদজানিস ?

যামিনীর আর এক বন্ধু ছিল, সতীশ রায়। সতীশ মা ও মেয়ের দুঃখ শুনিয়া তাহাদের নিজের বাসায় লইয়া আশ্রয় দিল বটে কিন্তু দিনকতক পরে সেখানেও গোলযোগ বাধিল। সতীশ সুলোচনাকে দেখিয়া পাগল হইল। এমন কি সতীশের মা সুলোচনা বিবাহিতা জানিয়াও ছেলের সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন; সুলোচনার মায়েরও অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু সুলোচনা একেবারে বাঁকিয়া বসিল। মাকে বলিল—মেয়েমানুষের ক-বার বিয়ে হয় ?তোমাদের সব মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে—আমায় আর লেখাপড়া শেখাতে হবে না তোমায়—তুমি আমাকে আমার শ্বশুরবাড়ি রেখে এসো, সেখানে বাঁচি আর মরি ! ঢের হয়েছে।

এখানে এই সময় একদিন আসিলেন প্রকাশদা।

প্রকাশদা সতীশের বন্ধু এবং ছাত্রমহলে নামকরা স্বদেশী। অ্যানার্কিস্ট বলিয়া খ্যাতিও তাঁহার যথেষ্ট রটিয়াছে তখন পুলিশের কৃপায়। প্রকাশদা সুলোচনার ইতিহাস সব শুনিলেন এবং প্রধানত তাঁহারই চেষ্টায় সুলোচনা বেথুন স্কুলে ভর্তি রইল। প্রকাশদা মাঝে মাঝে তাহার পড়াশুনার তত্ত্বাবধান করিতে আসিতেন।

এদিকে সতীশ বড় বিরক্ত করিয়া তুলিল। একই বাড়িতে থাকা, সর্বদা দেখাসাক্ষাৎ, সামনে না আসিয়া উপায় নেই। নানারকম দামী জিনিসপত্র কিনিয়া দিতে আরম্ভ করিল—সেন্ট,সাবান,কাপড়-জামা ইত্যাদি। সুলোচনা বলিল—মামা, এ-সব কেন দিস ?তুই বড় স্বার্থপর। এ-সব আমি নেব না।

মাকে বলিত—মা, অনেক মানুষ দেখলাম এ বয়সে, প্রকাশদার মতো মানুষ এ পর্যন্ত আর দেখিনি। অন্য ধাতের একেবারে। উনি মানুষ না দেবতা তাই ভাবি।

সতীশ দিত দামী দামী কাপড়, একবার পূজায় একখানা ভালো বেনারসী শাড়ি দিল। প্রকাশদা দিলেন একজোড়া মোটা স্বদেশী তাঁতের শাড়ি। সুলোচনার কি আহ্লাদ প্রকাশদার দেওয়া সেই মোটা শাড়ি পরিয়া ! সতীশদার দেওয়া ভালো শাড়ি সে কদাচিৎ ব্যবহার করিত, কিন্তু মোটা তাঁতের শাড়ি দুখানা পরিয়া রোজ স্কুলে যাইত।

একদিন সে প্রকাশদাকে সতীশের ব্যবহার সব খুলিয়া বলিল। প্রকাশদা বলিলেন—এখানে তোমাদের আর থাকা উচিত না। তোমার লেখাপড়া এখানে থাকলে কিছু হবে না, অন্য জায়গায় বাসা করো, খরচ যা হয় আমি তার ব্যবস্থা করব।

সুলোচনার এক দূরসম্পর্কের ভগ্নীপতি কানাই ধরের গলিতে সস্ত্রীক বাসা করিয়া থাকিত। সুলোচনারা সেই বাসায় উঠিয়া আসিল। আসিবার সময় সুলোচনা প্রকাশদার দেওয়া মোটা শাড়ি পরিয়া, সতীশের দেওয়া দামী কাপড়জামা সেখানেই রাখিয়া আসিল। সতীশ এই ব্যাপারে দিনকতক নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বিবেচনা করিয়া প্রকাশদার সঙ্গে পর্যন্ত দেখাসাক্ষাৎ ছাড়িয়া দিল। মা মেয়েকে বলিল—কেন সতীশকে অমন করে চটিয়ে দিলি ?ওর মনে কষ্ট দেওয়া হল না ?

সুলোচনা বলিল—কষ্ট না পেলে মামার জ্ঞান হবে না মা। তা ছাড়া দেখছ না, আমাদের জন্যে ও সর্বস্বান্ত হতে বসেছিল, ওর দেওয়া জিনিস আর নেব না।

তা সত্ত্বেও সতীশ ওদের নূতন বাসায় যাতায়াত করিত, জিনিসপত্রও দিতে ছাড়িত না। সুলোচনা বলিত—মামা, আবার কেন আসিস ?তুই বড় স্বার্থপর—স্বার্থের জন্যে সব করিস বলে আমার ভালো লাগে না। দেখ দিকি প্রকাশদাকে ?

একদিন সতীশ বলিল—আচ্ছা, আমি কি করলে তুই খুশি হবি সুলোচনা ?বল, আমি তাই করব।

সুলোচনা বলিল—তুই বিয়ে কর মামা। খুব খুশি হব তাহলে। আমায় যদি সন্তুষ্ট করবার তোর ইচ্ছে থাকে, খুব শিগ্‌গির একটি ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে করে ফেল।

নূতন বাসায় প্রকাশদা কিন্তু বেশি আসিতেন না এবং আসিতেন না বলিয়াই আমাদের বাসায় যেদিন প্রকাশদার আসিবার কথা থাকিত, সেদিন সুলোচনা এখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা করিত।

এই সময় আলিপুর বোমার মামলা আরম্ভ হইল। কি করিয়া প্রকাশদা ইহার মধ্যে জড়াইয়া পড়েন সে-কথা সুলোচনার মা আমায় বলিতে পারে নাই। প্রকাশদা দীর্ঘদিন অনুপস্থিত রহিলেন। সুলোচনা বড় ব্যস্ত হইয়া ছটফট করিত বলিয়া তাহার মা একদিন কলেজে খোঁজ করিতে গিয়া জানিল কলেজেও প্রকাশদা বহুদিন যাবৎ অনুপস্থিত।

ছ মাস পরে প্রকাশদা হঠাৎ একদিন এক হাঁড়ি রসগোল্লা হাতে ওদের বাসায় আসিয়া হাজির। সুলোচনা তো খবর পাইয়াই ছুটিতে ছুটিতে বাহিরের ঘরে আসিল। বলিল—কোথায় ছিলে প্রকাশদা এতদিন ?চেহারা এমন হয়েছে কেন তোমার ?

প্রকাশদা বলিলেন—সে কথা জিজ্ঞেস করিস কেন সু ! তা ছাড়া, এই শেষ—আমি স্বদেশীর আসামী, পুলিশ পেছনে ঘুরছে—আর আসতে হয়তো পারব না। যাবার সময় একটা কথা জিজ্ঞেস করে যাই—হয়তো আর দেখাই হবে না—সু, তুই আমায় কখনো ঘৃণা করবি নে বল ?

সুলোচনা বলিল—তোমাকে অনেক ভালোবাসি প্রকাশদা। যদি স্বামী না থাকত, তবে তোমার আরো নিকটে আসতুম। পা ছুঁয়ে বলছি—তা না হলে তোমার এই বিপদের সময়ে তোমার সঙ্গে চলে যেতুম !—একলা যেতে দিতুম না।

বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

সুলোচনার মা আমায় বলিল—মেয়ে আমার কখনো কাঁদত না। এই অনেকদিন পরে কাঁদল।যাবার সময় প্রকাশকে কড়ার করিয়ে নিলে বিপদ উদ্ধার হলেই আবার ফিরে এসে সকলের আগে ওর সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু প্রকাশ সেই যে গেল, আর কখনো ফিরে আসেনি।

আমি বলিলাম—তার পর ?আপনাদের কি হল ?

—তার পর প্রকাশ তো চলে গেল। শোন সব কথা, বিশ্বাস করবে না হয়তো। এই কলকাতা শহরে সেই পোড়ারমুখী মেয়ের আগুনের মতো রূপ নিয়ে সে কি কষ্ট, কি বিপদ গিয়েছে আমাদের ! দেখেছিলে তো তাকে ?

দেখিয়াছিলাম বই কি ! আবার এই প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর পরে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অপরাহ্নের মৃদু স্তিমিত রৌদ্রালোকে সুলোচনার সেই অপূর্বসুন্দর কিশোরীমূর্তি স্পষ্ট মনের চোখে ফুটিয়া উঠিল। তার সেই ডাগর ডাগর চোখ, ঘন-কালো চুলের রাশি...কথার সেই ভঙ্গি...চমৎকার মুখের হাসি...সর্বোপরি তার অনিন্দ্য মুখশ্রী...

তখন সুলোচনাকে বুঝি নাই, চিনি নাই—অভিজ্ঞতার অভাবের দরুন সুলোচনাকে সে সময় চরিত্রহীনা উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির মেয়ে বলিয়া ভাবিয়াছি। শুধু আমি নই, আমার বন্ধুর বাসার মেয়েরা সুলোচনা সম্বন্ধে এই মন্তব্যই হৃদয়ঙ্গম করিত ! আমিও বিশ্বাস করিতাম। মনে মনে পরলোকবাসিনীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।

সুলোচনার মা বলিল—মেয়ে রোজ কাঁদে প্রকাশ চলে যাওয়ার পরে। জানলা খুলে চেয়ে থাকে। সতীশকে দু-চোখে দেখতে পারে না। এদিকে যে বাসায় আমরা ছিলাম, তারা ঠিকমতো টাকা দিতে না পারাতে আমাদের রাখতে চাইলে না। কালীঘাটে আমরা উঠে গিয়ে ছোট একটি খোলার ঘরে আশ্রয় নিলাম। একদিন সেখানে এল কোথাকার রাজার ম্যানেজার—দশ হাজার টাকার লোভ দেখালে। মেয়ের গা সোনায় মুড়ে দেবে। মেয়ে

বললে—মা, চুলগুলো কেটে ফেলি, নয়তো পারি নে ! আমি বাড়ি নেই, গুণ্ডার দল বাড়ি ঘিরে ফেলেছে—বললে বিশ্বাস করবে না—এই কালীঘাটে, ইংরেজ-রাজত্বের মধ্যে ! মেয়ে মাথায় কেরোসিন তেল ঢেলেছে—চুলে আগুন জ্বেলে মরবে, এমন সময় আমি গিয়ে পড়লাম—লোক-ডাকাডাকি করলাম, গুণ্ডার দল পালাল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—সতীশদা যেত না বাসায় ?

—যেত, টাকা দিয়ে আসত আমার হাতে মেয়েকে লুকিয়ে। মেয়েও বড্ড নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে সতীশের সঙ্গে। একটা মুখের ভালো কথাও ইদানীং বলত না। আগে আগে ওর চিঠির এক-আধখানা উত্তর দিত—শেষে তাও বন্ধ করে দিলে। আমায় বলত—না মা, ওকে আসতে দিয়ো না।ও যে সর্বস্বান্ত হল আমাদের দিয়ে ! কুকুরের মতো আমরা ওর টাকা খাচ্ছি কেন ?ও বিয়ে-থাওয়া করবে না আমাদের না ছাড়লে।

এই সময় পাড়ার সহৃদয় প্রৌঢ় ডাক্তার নিজে চেষ্টা করিয়া সুলোচনাকে মেডিকেল কলেজে নার্সের কাজ শিখিবার জন্য ভর্তি করিয়া দিলেন—পাশ করিয়া প্রথমত সেই ডাক্তারের ডাক্তারখানাতেই কাজ পায়। কিছুদিন সেখানে কাজ করিবার পরে একদিন মাকে আসিয়াবলিল—মা, এ জগতে সব সমান। ওখানে আর আমার কাজ করা চলবে না। ছেড়ে দিয়ে এলুম।

মাস-দুই পরে ক্যাম্বেল হাসপাতালে কাজ জুটিল। তখন ওদের পটলডাঙায় বাসা। মা ক্যাম্বেলের গেট থেকে রোজ রাত এগারোটার সময় মেয়েকে বাসায় আনে সঙ্গে করিয়া। তাহার মধ্যেও বহু বিপদ গেল। ক্যাম্বেলের নার্স সুলোচনার রূপের খ্যাতি তখন চারিদিকে ছড়াইয়াছে, ছাত্রমণ্ডলীর অনেকেরই বাসন্তী প্রেমের-স্বপ্ন সে—কত প্রলোভন তাহাকে যে প্রতিদিন এড়াইয়া চলিতে হইত ! গুণ্ডার হাতে পড়িতে পড়িতে কতদিন বাঁচিয়া গিয়াছে। একদিন মাকে বলিল— প্রকাশদা ফিরে এসে এ রকম দেখে খুশি হবে না। সে দেখে অসন্তুষ্ট হয় এমন কাজ কখনো করব না। তুমি আলাদা ছোট বাসা করো—আমি ক্যাম্বেলে নার্সদের হোস্টেলে যাই।

তাহাই হইল। হোস্টেলে দুজনের নাম দিল যারা করিতে পারিবে—স্বামীর ও প্রকাশদার— আশা ছিল প্রকাশদা একদিন হঠাৎ আসিয়া পড়িবেই।

সুলোচনার মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা, কখনো এর পরে প্রকাশদার পত্র-টত্র আসত না ?

বুড়ি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কখনো না। মেয়ে প্রকাশদা বলতে অজ্ঞান। ভাবত, প্রকাশ আসবে ফিরে। আমায় কতদিন বলেছে এ কথা। প্রকাশ দেখে খুশি হবে বলেই তো দমদমায় অতিথিশালা খোলা হল ওর স্বামীকে নিয়ে এসে।

আমি অবাক হইয়া বলিলাম—অতিথিশালা ! সে কি রকম ?

—মেয়ের খেয়াল ! এদিকে প্রকাশের নাম ক্যাম্বেলের হোস্টেলে লেখানো, ওদিকে দমদমায় অতিথিশালা খোলা প্রকাশকে খুশি করবার জন্যে—প্রকাশ তখন মরে ভূত হয়ে গিয়েছে।

—ওর স্বামীকে আনলেন বুঝি আবার ?

—আমরা আনিনি বাবা। ক্যাম্বেলে একজন রুগী এসেছিল সুলোচনার শ্বশুরবাড়ির গাঁ থেকে। সে গিয়ে খবর দিলে। স্বামী এসে পড়ল, মাপ চাইলে—আমরাও দিলাম এই ভেবে যে স্বামী ভিন্ন বাইরে পদে পদে বিপদ। স্বাধীন হয়েও রূপ নিয়ে সর্বদা সশঙ্কিত। কেউ মিত্র নেই, সবাই শত্রু। আজ যে বন্ধু, কাল সে শত্রু। ওর স্বামীকে নিয়ে দমদমায় বাসা করা গেল। যে যায় সেই খায়, তাই নাম হল অতিথিশালা।

আমার সঙ্গে এই সময়েই সুলোচনার দেখা হইয়াছিল। সে-কথাও আমি বৃদ্ধাকে বলিলাম।

বৃদ্ধা বলিল—তোমার কথা বলেছিল, এখন আমার মনে হচ্ছে বাবা। তার পর ও চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্র্যাকটিস করতে লাগল। বেশ দু-পয়সা আয় হল। দুটি ছেলে হল। জামাইয়ের এককাঁড়ি দেনা ছিল দেশে, সব ও শোধ দিলে। সেই সময় একদিন কে এসে বললে দমদমার বাসায়—প্রকাশ মারা গিয়েছে। শুনেই

মূর্ছাহয়ে পড়ে গেল—সেই থেকে বুকের রোগ। তাতেই শেষে মারা গেল। খবরটা শোনার পর মোটে ছটি মাস বেঁচে ছিল।

দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

বৃদ্ধা অন্যমনস্কভাবে বলিল—সন্নিস্যি হয়ে যাব বলে আপদ বিদেয় করবার জন্যে আট বছর বয়েসে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম। সে কোথায় চলে গিয়েছে আজ, আমি এই পঁয়ষট্টি বছর বয়েসে এখনো ভুগছি বন্ধনে ! সে স্বামীকে ভালো করলে, তাকে মদ ছাড়ালে, মানুষ করলে—করে মরে গেল ! জামাইও মারা গিয়েছেন। এখন আমি যদি মরে যাই, ছেলে দুটো নিরুপায়। কোথায় দাঁড়াবে ! রাস্তায়—গবর্নমেন্টের রাস্তায়।

আমার দিকে চাহিয়া বলিল—ইদানীং আমাদের বড় সুখ হয়েছিল। সে তুমি দেখোনি। খাট, আলমারি, বাসন,—সুলোচনা প্র্যাক্‌টিসে বেশ রোজগার করত—টাকা জমিয়ে এ-সব করেছিল। শৌখিন ছিল খুব, সে তুমিও তো দেখেছ। ময়লা কি কুশ্রী জিনিস দু-চোখে দেখতে পারত না। হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়ল—জামাইয়ের হাতে অনেক টাকা পড়ল মেয়ে মারা যাওয়ার পরে। জামাই তেজারতি করতে গিয়ে হাওড়ায় জমি বন্ধক রেখে দু হাজার টাকা ধার দিয়েছিল—তার পরে সে-ও তো মরে গেল। হ্যান্ডনোটখানা এখনো আছে, হ্যাঁ বাবা, তাতে কিছু হয় ?

বুড়িকে বলিলাম, চোদ্দ বছর পরে সে হ্যান্ডনোটে আর কিছু হইবে না। রাখিয়া ঘরের জঞ্জাল বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো সার্থকতা তার নাই।

হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়িল। বলিলাম—আচ্ছা, ওর সঙ্গে একটা ছোকরাকে বেড়াতে দেখেছিলাম। সে কে জানেন ?

বুড়ি বলিল—শ্যামবর্ণ একহারা চেহারা তো ?বছর বাইশ বয়েস ?ও তো তার দেওর। পুন্নর জ্যাঠতুত ভাই—দমদমার বাসায় থেকে পড়ত।

আমার কতদিনের ভুল ভাঙিয়া গেল। কি অবিচার করিয়াছি সুলোচনার প্রতি।

সুলোচনা যে-যুগে বাহিরে চলাফেরা করিত, সে যুগে মেয়েদের অমন ভাব কেহ পছন্দকরিত না বলিয়াই তাহার নামে নানা কথা উঠিয়াছিল। সেই তরুণীর সচেতন অন্তরাত্মা যাহাকে ভালোবাসিয়াছিল, তাহারই একনিষ্ঠ ধ্যানে সে দিনের পর দিন বৃথা অপেক্ষা করিয়া মরিত আশার কুহকে।

ক্যাম্বেলের সামনে দিয়া ট্রামে যাতায়াত করিবার সময় অভাগী সুলোচনার কথা আজকাল বড় মনে পড়ে।